বেলিণ্ডার উপাখ্যান

মনে করুন কোন মন্ত্রবলে আপনি আপনার প্রাক-বিবাহ অবস্থায় ফিরে গেছেন। আবারও কি আপনি আপনার এই বর্তমান জীবনসঙ্গীটিকেই স্বামী/স্ত্রী হিসেবে বেছে নেবেন? নাকি, ভুল শুধরে নেবার এই সুবর্ণ সুযোগটির সদ্ব্যবহারের প্রচেষ্টায় তৎপর হবেন? পাঠক! ম্যাগাজিনের পাতায় এহেন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন আপনি বহুবার এবং এ প্রশ্নের একমাত্র সরল সুন্দর মানানসই উত্তরটাও আপনার মুখস্ত, "আলবৎ! একশো বার!! এ আবার একটা প্রশ্ন হল নাকি মশাই?"

আমি কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব অত সহজে দিতে পারি না। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-শঙ্কা-ভয়ে পিছিয়ে যাই। একবার যদি কোনমতে জীবনের চৌ-রাহায় ফিরে যেতে পারি, আবার কি জেনেশুনে এই পথে পা বাড়াবো? আবার? পাঠক, আপনার অনুমান পুরোপুরি সত্য নয়। আমার বিবাহোত্তর জীবনের সকল অশান্তির মূলে নারীকুল হলেও, ব্যাপারটা আপনি যা মনে করছেন ঠিক তা নয়।

বিয়ের আগেই গণ্ডগোল বাধলো হবু জামাইয়ের চাকরি নিয়ে।

বাবা তিন বার মাথা নেড়ে বললেন, "অসম্ভব। পাইলটের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবো না। কিছুতেই না।"

আমার বাবা বরাবর ভারী একরোখা। এক কথার মানুষ। একবার যদি না বলেন, সেই না কে হ্যাঁ করায় সাধ্য কার ! সেই তিনি তিন তিন বার বলেছেন এ বিয়ে হতে পারে না। তখনই কথা শেষ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু আমি যে বাক্‌দান করে বসে আছি !

নীচু গলায় বললাম, "ও পাইলট নয় বাবা, পাইলট অফিসার। ওটা এয়ার ফোর্সের একটা র‍্যাঙ্ক। ডাক্তাররাও পাইলট অফিসার হয়। ও ইঞ্জিনীয়ার।"

গেনুকাকা বললেন, "তুমি এখানেই বিয়ে দাও খগেনদা। এত ভাল ছেলে, গোত্র-টোত্র সব মিলে যাচ্ছে যখন। এ প্রজাপতির নির্বন্ধ। তা না হলে মেয়ে তো তোমার নাবালিকা নয়। চাকরি বাকরি করে। এত বছর এত চেষ্টা চরিত্তির করেও তো কোন ফল হয় নি। বিয়ে করবে না বলে ধনুর্ভঙ্গ পন করে বসেছিল। এতদিনে তবু মত হল।"

বাবা গেনুকাকার বাচালতায় মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হলেন। যে বাবাকে ভোজপুর জেলার তাবৎ জনতা ভয়-ভক্তি করে, তাঁরই একমাত্র সন্তান যে নানা তুচ্ছ অবান্তর কারণ দেখিয়ে তাঁরই বাছাই করা সব ক'টা পাত্রকেই এক এক করে নাকচ করে এসেছে এযাবৎ, বড় গলা করে বলার মত কথা এ নয়। তবে কিনা গেনুকাকা বাবার দাবা খেলার সাথী, এক কল্‌কের ইয়ার। একমাত্র উনিই বাবার সঙ্গে নির্ভয়ে কথা বলতে পারেন। বাবার কাছে তাঁর কথার দাম আছে। তাছাড়া ওই যে গেনুকাকা বললেন গোত্র মিলে গেছে --- মেয়ে নাবালিকা নয়, একথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকু বাবা ধরতে পেরেছেন। এযাত্রা গোত্র মিলে গেছে। বাগড়া দিয়ে এ বিয়েটা রোধ করতে পারেন হয়তো, কিন্তু এর পর মেয়ের আবার যদি কাউকে মনে ধরে আর সে ছেলে যদি অজ্ঞাত কুলশীল কেউ হয়, সাবালিকা চাকুরে মেয়ের ঘাড় ধরে তাকে প্রতিবার বিরত করতে পারবেন কি তিনি?

তাছাড়া সময় তো বসে নেই। মেয়ের জীবনভোর অকুস্থলে উপস্থিত থেকে তার খবরদারি করতে পারবেন, মরদেহের অতখানি ভরসা কি আছে? অতএব বাবা তাঁর অমত প্রত্যাহার করলেন। কিন্তু সে আর ক'দিন?

ফর্দ মিলিয়ে বাজারঘাট, আত্মীয় কুটুম্বদের চিঠি লেখালেখি, গয়নার প্যাটার্ণ পছন্দ --- এর মধ্যে হঠাৎ বাবা একদিন মুখ অন্ধকার করে ঘোষণা করলেন, "এ বিয়ে হবে না।"

"সেকি? কেন?"

"পাইলটের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবো না আমি।"

গেনুকাকা বিরক্ত হয়ে বললেন, "এসব কথা তো গতমাসে হয়ে গিয়েছে একবার। শুনলে তো ছেলে ইঞ্জিনীয়ার।"

বাবা আরক্ত মুখে একখানা চিঠি বের করে দেখালেন। বললেন, "আশিসের চিঠি। ওর দিল্লীতে বদলি হয়েছে। নতুন ঠিকানা পাঠিয়েছে।"

বাবা মধ্যপথে থেমে গিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগলেন। অত্যধিক রেগে গেছেন আর কি ! ব্যাপার সুবিধের নয় বুঝে একপাশে এসে দাঁড়িয়েছিলাম।

ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করলাম, "তাতে কি হয়েছে বাবা?"

"কি হয়েছে? এই দ্যাখো। ও এখন আর পাইলট অফিসার নেই। ও এখন ফ্লাইং অফিসার। বুঝলে, ফ্লাইং অফিসার। ফ্লাইং মানে কি জানো তো? নাকি আমাকে নতুন করে ইংরিজি শিখতে হবে আবার?"

বিয়ের মাত্র ছ'দিন বাকি তখন। ট্রাঙ্ক কলে আশিস্‌কে সকল বারতা শোনালাম। পরদিন এয়ারফোর্স ম্যানুয়াল সহ ওর এক কোর্সমেট জীপে চড়ে আমাদের বাড়ি এসে বাবার সঙ্গে ঘণ্টাদুয়েক বসে এয়ারফোর্সের কায়দাকানুন আদ্যোপান্ত বুঝিয়ে দিয়ে গেল। বাবা একগাল হেসে আমাদের ডেকে বললেন, "আশিস্‌ প্রোমোশন পেয়েছে। পাইলট অফিসার থেকে ফ্লাইং অফিসার। এর পর হবে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। ওড়া-উড়ির সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। এগুলো হল র‍্যাঙ্ক।"

বিয়েটা নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। দিল্লীতে এলাম। আশিসের নটা পাঁচটা অফিস। বাড়ির কাজকর্ম, গল্পের বই, প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে গল্পগুজব, এই সব নিয়ে থাকি সারাদিন। ছুটির দিনে দু'জনে বেরিয়ে পড়ি। সিনেমা, পিকনিক, বাজারহাট, বন্ধুদের নিয়ে হৈ চৈ করে সময় কাটে। এরপর আমাদের সংসারে তৃতীয় একজনের আবির্ভাব আরও পরিপূর্ণ, আরও মধুময় করে তুললো জীবনটাকে। দিল্লীতে দুটো বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল।

দিল্লীর পর পাঠানকোট। পাঠানকোটে আসার আগে আসন্ন বিপদের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি। বরং এয়ারফোর্স স্টেশনে পা দিয়ে একটু বেশীই উৎফুল্ল হয়েছিলাম। কি সুন্দর ছায়া ঘেরা গাছ-গাছালি ভরা জায়গা! মনে হল আদ্যিকালের মুনি ঋষিদের তপোবনে এসেছি। ঝকঝকে ঘর-বাড়ি, সাজানো বাগান, বাধ্য অনুগত ঝি-চাকর। চমক ভাঙলো দুদিন পরে।

সকাল আটটা নাগাদ ফোন করলো প্রতিবেশিনী রমা রাও, "আজ লেডীজ ক্লাবের মিটিং আছে। নটার সময় কোচ আসবে। তৈরী থেকো।"

বাবলুকে সবে তেল মাখাতে বসেছি। তেল মাখিয়ে আধ ঘণ্টাখানেক রোদ্দুরে ফেলে রেখে তারপর স্নান করাবো। ওকে ঘুম পাড়িয়ে নিজে স্নান করবো। তারপর রান্নাবান্নার তদারক। আগাথা ক্রিষ্টির বইখানা আধ-পড়া হয়ে আছে সেই কবে থেকে।

বললাম, "আমি ভাই যাবো না আজ।"

রমা রাও ব্যস্ত হয়ে বললো, "কি ব্যাপার, অসুখ বিসুখ করেছে নাকি?"

"না-না, তা নয়। এমনি। আজ আর যেতে ইচ্ছে করছে না। রাজ্যের কাজ পড়ে আছে। আমার ছেলেটা আমায় ছেড়ে থাকতে চায় না। ওর স্নান খাওয়ার টাইম এখন।"

রমা রাও বললো, "কিন্তু তোমাকে তো যেতেই হবে। বেলিণ্ডা ভীষণ চটে যাবে নইলে। তাছাড়া আজকে তো তোমাদের অফিসেরই টার্ন।"

"বেলিণ্ডা মানে? আমাদের অফিস মানে?"

রমা রাও ধীর সহিষ্ণু গলায় যা বললো তা এই। লেডীজ ক্লাবে যাওয়া না যাওয়া আমার ইচ্ছাধীন নয়। যেতেই হবে যদি না কোন সাংঘাতিক জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত হয়। আর সেরকম ক্ষেত্রে বেলিণ্ডার কাছে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে ক্ষমাপ্রার্থনা এবং আগাম অনুমতি গ্রহণ একেবারে বাধ্যতামূলক।

"কে এই বেলিণ্ডা?"

"বেলিন্ডা কে জানোনা? ওমা, ওই তো মিসেস ও.সি.। ও.সি. অর্থাৎ অফিসার কম্যাণ্ডিং। এই স্টেশনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।"

"কিন্তু এদেশে কি মেয়ে ও.সি. হয়? সে তো আমেরিকাতেই হয় শুনেছি।"

"আজ্ঞে মেয়ে ও.সি. নয়। মিসেস ও.সি. অর্থাৎ ও.সি.র গিন্নি। এ তল্লাটে তার বিনানুমতিতে একটা ঘাসের পাতা নড়া মানা, একটা কাকপক্ষীর রা কাড়ার নিয়ম নেই। অতএব চটপট চলে এসো। নহিলে

বিপদ ভারী।" পালা করে এক একটা স্কোয়াড্রন ও সেকশনের গিন্নিদের উপর ভার পড়ে খান-পান-মনোরঞ্জনের। আজ সিগ্‌নাল্‌সের দিন। আশিস্‌ সিনিয়র সিগ্‌নাল্‌স্‌ অফিসার এই স্টেশনে।

দুপুরে আশিস্‌ বাড়ি এলে শোনালাম সব।

"তুমি অফিসে কাজ করে মাইনে আনো। আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন?"

আশিস্‌ হাসলো, "দস্যু রত্নাকরের বউয়ের মত কথা বলছো দেখছি !"

"বলবোই তো। তুমি সিগনাল্‌স্‌ সেক্‌শনে আছো তো আমার কি? তাছাড়া বাড়িঘর ফেলে লেডীজ ক্লাবে যেতে আমার যদি শখ না থাকে? ওরা হুকুম করার কে?"

সন্ধ্যাবেলা রমা রাও স্বামীসহ এসে হাজির।

বললো, "এ যাত্রা তোমার ফাঁড়া কেটে গেছে মিসেস চ্যাট্‌। কি আর করবো, মিথ্যে কথাই বলতে হল। বললাম তুমি রেডী হয়ে বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলে। তুমি ভাই সক্কলকে সেই কথাই বোলো। এখানে আবার কুঁজড়ো-কুটনীদের অভাব নেই, কে কোথায় শুনে ফেলে বেলিণ্ডাকে বলে আসবে। আমার কর্তা চ্যাটের সঙ্গে কানপুরে কাজ করেছে, ভীষণ প্রশংসা করে। বেলিণ্ডার কুনজরে পড়লে চ্যাটের চাকরির বারোটা বেজে যাবে ভাই।"

রাও দম্পতি যেতে না যেতে আরও ক'টি জুটি এলো। আলাপ করতে এসেছে। মহিলাদের কৌতূহলী কুশলপ্রশ্নে বুঝলাম কথাটা বেশ ভাল করেই রটেছে। এমন কি হঠাৎ অমন মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম কেন, এর পিছনে নিহিত মধুর ইঙ্গিতটুকুও ধরা পড়েছে ওদের কাছে।

খুশি খুশি গলায় বললো, "আমারও ভাই দু'টি বাচ্চার বয়সের ব্যবধান খুব কম। ঝট্‌পট্‌ ফ্যামিলি কম্‌প্লিট করে ফ্যালো। তারপর চ্যাট্‌কে বলো ফটাফট্‌ অপারেশন করে ফেলতে। নিত্যি ভয়ে ভয়ে থাকা কাঁহাতক পোষায় !"

আশিস্ বললো, "ও.সি.র বাড়িতে কল্ অন্ করতে হয় একদিন। যে দিন খুশি যাওয়া যাবে না। দিন-ক্ষণ জেনে নিয়ে আগাম জানান দিয়ে যেতে হবে ওঁদের সময় সুবিধে অনুসারে।"

ইতিমধ্যে আরেক দফা লেডীজ ক্লাবের মিটিং হল। মাসে দু'বার করে হয়। প্রত্যেক বার তো আর মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া যায় না! নিয়মিত মাথা ঘোরার মত গ্রহণযোগ্য অজুহাত যখন নেই। অতএব দলে ভিড়ে যেতে বাধ্য হলাম। দেখলাম বেলিণ্ডাকে।

পাশের মহিলাকে বললাম, "উনি অ্যাংলো তো নন ! নাম শুনে তাই ভেবেছিলাম।"

পার্শ্ববর্তিনী বললো, "অ্যাংলো মানে? দিব্যি খাতি-পিতি জাঠ্নি। ওর আসল নাম বলবিন্দর। এখানকার রীতি-রেওয়াজ মত বেলিণ্ডা হয়ে গেছে। ওর কর্তা হরজিন্দর যেমন হ্যারি।"

সে যাই হোক, একখানা ব্যক্তিত্ব বটে। যেমন জাঁদরেল চেহারা তেমনি জবরদস্ত আচার আচরণ। স্পেশাল অর্ডার নিয়ে মিসেস ও.সি. গড়তে বসলেও সৃষ্টিকর্তা বেলিণ্ডাকে টেক্কা দিয়ে কিছু বানাতে পারতেন না। এ যেন মিসেস ও.সি. হতেই ইহলোকে জন্ম তার।

পাঠানকোটে তিন বছর ছিলাম। দেড় বছরের মাথায় বেলিণ্ডাদের বদলি হয়ে গেল। আরও বড় স্টেশনের কম্যাণ্ডিং অফিসার রূপে। আমার তদ্দিনে হাড় ভাজাভাজা হয়ে গেছে। সব সময় কণ্টকিত হয়ে থাকি এই বুঝি পেয়াদা এসে ডাক দেয়। বেলিণ্ডার যেমন স্বাস্থ্য তেমনি স্ফুর্তি, তেমনি উর্বর মগজ। কখনো ফোন আসে মাধোপুরে পিক্নিকে যেতে হবে, কখনো বা সুদূর রোজ গার্ডেন থেকে বাছাই করে গোলাপের চারা আনতে হবে, কিংবা ধাপধারা কোন গাঁয়ে গিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে পর্দানশীন বউদের পরিবার নিয়োজনের তালিম দিতে হবে আমাদের। যখন যা হুজুগ উঠবে, মহিলাদের কোমর বেঁধে নেমে পড়তে হবে একেবারে এক মিনিটের নোটিসে।

এ ছাড়া ক্যাম্পে তো বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। হয় হাজ্বেণ্ডস্ নাইট, নয় চিল্ড্রেন্স্ ডে, নয়তো বা ভি.আই.পি.দের আগমন। ক্যাম্পের মহিলারা সদাসর্বদা শাম-এ-আওয়ধ, মক্ শিপ্ রেক্, ফ্যাশন প্যারেড্, কাওয়ালি নিয়ে প্রস্তুত। নাচ-গান-চুটকুলার মহড়া

চলতেই থাকে বারো মাস, তিনশো পঁয়ষট্টি দিন। এই বেলিণ্ডার নির্দেশেই রাসলীলায় গয়লানী সাজতে গিয়ে আর.টি.সেণ্টারের মিলিটারী গরুর লাথি খেয়ে ঝাড়া তিন মাস পায়ে প্লাস্টার লাগিয়ে থাকতে হয়েছে আমায় এবং তারই মধ্যে, সেই প্লাস্টার করা পা নিয়েই ফ্যাশন প্যারেডে স্ট্যাটিক ডিসপ্লে হয়ে খাড়া থেকেছি রাতভোর। বিশ্বাস না হয় ফটো দেখাতে পারি। সে ফটো এখনও আমার কাছে আছে।

বেলিণ্ডার পরে এলো লিজি মুখার্জি। আইবুড়ো কালে নাকি লাজবন্তী শর্মা ছিল। বিয়ে করে লিজি হয়েছে। আমরা তখন বেলিণ্ডার বদলে স্বয়ং যমরাজকেও মিসেস ও.সি. রূপে দুহাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত। লিজি আসায় বেশ একটা পরিবর্তন অনুভব করলো সবাই। কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব। অবশ্য অল্প কিছুদিন। তারপর ক্রমশ লিজি মুখার্জির ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে ছেয়ে গেল ক্যাম্প জুড়ে। মহিলামহলকে নতুন ধাঁচে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হলেন তিনি। লিজির 'মটো' বা নীতিবাক্য ছিল নারীজাগরণ। নব্যযুগের লিব্ মুভ্‌মেণ্ট নয়। ভারতীয় নারীর শাশ্বত গরিমার পূণরাভ্যুত্থান। সেলাই ফোঁড়াই, মুখরোচক রান্নাবান্না, আলপনা-রংগোলি, অন্যান্য হাতের কাজ। এই লিজির আমলেই একদিনে তিরাশিটা কুলফি বানিয়েছি একা হাতে, ক্যাম্পে দেওয়ালী উপলক্ষে চিল্‌ড্রেন্‌স্ পার্টির স্টলে চার পাঁচ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে সেই কুলফি শস্তা দামে বিক্রী করেছি এবং শেষমেশ ওই কুলফির দরুন লেডীজ ক্লাবের ক্ষতির ভরতুকি দিয়েছি নিজের সংসার খরচের তহবিল ভেঙ্গে।

দেখতে শুনতে লিজি ছিল বেলিণ্ডার একেবারে বিপরীত। পাতলা ছিমছাম মানুষটি, অতি হালকা মেকআপে ও ফিকেরঙের শিফন-জর্জেট-মলমলের শাড়িতে শীর্ণ ফ্যাকাসে চেহারাখানায় সবসময় একটা রুগ্নতার আভাস ফুটে উঠতো। কথা বলতো খুব নীচু গলায়, প্রায় ফিস ফিস করে। সে আর এক বিপদ। লিজি কি বললো অথবা কি বললো না, সঠিক বুঝতে না পেরে আতঙ্কে কাঁটা হয়ে থাকতাম আমরা। পুডিং প্রতিযোগিতায় কাকে কি বানাতে বলেছে ঠিক করতে না পেরে সবাই সবকটা আইটেম বানিয়ে নিয়ে গেল বাড়ি থেকে। তারপর ওয়েলফেয়ার ডে'তে বিলি করার জন্যে আমাকে দু-ডজন নিকার না নাইটি সেলাই করতে বললো শুনতেই পেলাম না। অন্য যারা ছিল, তাদেরও সেই দশা।

লিজি এক একজন মহিলার পানে মুখ ফিরিয়ে ঠোঁট নাড়ে আর

কৃতার্থ গদগদ হয়ে মহিলা সোৎসাহে বলে ওঠে, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।"

তারপর লিজি চলে গেলে একে ওকে তাকে শুধিয়ে ফেরে, "হ্যাঁ ভাই, কি যেন বললেন উনি? বালিস না ব্রা? বালতি না বেবী ব্ল্যাংকেট?"

আমার অবশ্য খুব একটা অসুবিধে হয়নি। নিকার আর নাইটি দুইই দু'ডজন করে নিয়ে গেছিলাম। নিকার চাই শুনে, নাইটিগুলো তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। বছর আষ্টেক আগের ঘটনা এসব। সেই নাইটি বিলিবন্দেজ করতে গোড়ার দিকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল আমাকে। ঠিকে ঝি'র পুজোর পার্বণি থেকে ভাইঝির বিয়ের উপহার সবই একাধারে ওই দিয়ে চালিয়ে গেছি। আর বাড়ির লোকেরা তো আছেই। একবার নাইটি পরার সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের পর ওতেই অভ্যস্ত হয়ে গেলাম আমরা। আমার খুড়শাশুড়ি সেই যে শাড়ি পরা ছাড়লেন, এখন আবার তাঁর জন্যে নতুন করে নাইটি বানিয়ে দিতে হয় ফি বছর। সে দু-ডজন নাইটি তো কবেই খরচ হয়ে গেছে।

এই লিজির কল্যাণেই একবার ক্যাম্পসুদ্ধু সক্কলকে রোদে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ও.সি.র কাছ থেকে বকুনি খেতে হয়েছিল ঝাড়া এক ঘণ্টা ধরে। হাটের ভিড়ে ছাতা মাথায় লিজিকে দেখে তাকে অভিবাদন না জানানোর অপরাধে। আসলে ছাতার মধ্যে ছোট্ট মানুষটি কারো নজরেই পড়েনি মোটে। হাটে তখন বেচাকেনা চলছে পুরোদমে। মাল আসতে না আসতেই বিকিয়ে যাচ্ছে। পোনা মাছ আর আনাজপত্তর খরিদ নিয়ে ব্যস্ত সবাই। দোকানিরা তো লুটতে পারলে বাঁচে। চোখ কান সজাগ না রাখলে কোথা থেকে পচা মাল, অচল মুদ্রা চালিয়ে দেবে, ওজনের গোলমাল করবে। এর মধ্যে ছাতার আড়ালে ওসিনি যে গিয়ে উপস্থিত হবে ভাবতে পারেনি কেউ। কিন্তু ও.সি.কে সে কথা বোঝাবে কে? কার ঘাড়ে অতগুলো মাথা?

কিন্তু বেলিণ্ডার কাহিনী শোনাতে বসে লিজিকে নিয়ে পড়লাম কেন? বেলিণ্ডার কাহিনীতে ফিরে আসা যাক। আমাদের মহিলামহলে একটা প্রবাদ ছিল --- "রোগা হবার সব থেকে সুনিশ্চিত উপায় কি? না, বেলিণ্ডার রাজত্বে বাস।" সেই বেলিণ্ডা আমাদের লিজির হাতে সমর্পণ করে চলে গেল। তারপর নানা জায়গায় ঘুরেছি। কত বাঘা বাঘা মহিলাদের খপ্পরে পড়েছি। বেলিণ্ডাকে ভুলতে বসেছি প্রায়। হেনকালে

হালোয়ারায় বদলি হল আমাদের।

"হালোয়ারায় এখন ও.সি. কে গো?"

"ও.সি. নয়, এ.ও.সি.। এক ধাপ উপরে। ওঁকে চেনো তুমি। এয়ার কমোডোর হ্যারি।" চোখ কপালে তুলে বললাম, "ও মাগো ! আবার বেলিণ্ডা !"

হালোয়ারায় গিয়ে আবার সেই রমা রাওয়ের সঙ্গে দেখা।

বললো, "কি, মনে পড়ে? লেডীজ ক্লাবের হাতে খড়ি আমিই দিয়েছি তোমায়।"

বললাম, "সে কথা কি ভোলা যায়? বাব্বাঃ, সেকি হাতে খড়ি! প্রথম মোলাকাতেই বেলিণ্ডা, একেবারে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।"

রমা রাও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "আহা বেচারী।"

বিস্মিত চোখে চেয়ে রইলাম। দশ-বারো বছরে মেজে ঘষে দিব্যি খানদানী মিলিটারী মহিলা হতে বসেছি, আমার মধ্যে বেচারিত্বের কি দেখলো আবার?

রমা রাও আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, "মা কি ছিলেন আর মা কি হলেন।"

বললাম, "কার কথা বলছো তুমি?"

"কেন, বলবিন্দর কাউর।"

"বেলিণ্ডা? তার আবার কি হল? সেই তো ওসিনি এখানে। থুড়ি, ওসিনি নয়, এওসিনি।"

রমা রাও বললো, "না ভাই, সে সব চুকে বুকে গেছে। তুমি বুঝি কিছু শোনোনি? কেন, এতো প্রায় বছর দুয়েকের পুরোনো কেচ্ছা?"

খবর শোনালো রমা রাও। বেলিণ্ডার সে দাপট দূরে থাক, মোটে বেলিণ্ডাই নেই এখানে। হ্যারি নাকি ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিল এতকাল। দিল্লীর কোন সিভিলিয়ান লেডী ডাক্তার, বেলিণ্ডার চিকিৎসাসূত্রে যাওয়া আসা ছিল। হ্যারির সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক্রমে গভীর প্রেমে পরিণত হয়। হ্যারি নাকি বলেছে ওকেই বিয়ে করবে বেলিণ্ডাকে তালাক দিয়ে। তবে তালাক দেওয়া অত সোজা নয়। সরকারী, বিশেষ করে মিলিটারী

চাকরিতে নিয়ম-কানুন মাফিক চলা চাই। বেলিণ্ডা এখন তার সাবেক গ্রামের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। কাগজে কলমে এখনও এওসিনি সে-ই, তবে সেটা কাগজেই শুধু। হ্যারি আর লেডী ডাক্তারের প্রণয় কাহিনী নাকি এখন একেবারে ওপেন সিক্রেট। ছুটিছাটা হলেই দিল্লী ছোটে হ্যারি। শ্রীমতীও কয়েকবার দর্শন দিয়ে গেছে। খোলাখুলিভাবে তাকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করে হ্যারি, একেবারে নির্দ্বিধায় ----।

রমা রাও কাহিনীর শেষে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো আমার মন্তব্য শোনার আশায়। আমার মুখে কোন কথা জোগালো না। মনশ্চক্ষে বেলিণ্ডার চেহারাখানা ভেসে উঠলো। এরকম খাণ্ডারণী ধূমাবতীর আওতায় থেকে পরকীয়া চালিয়ে যাবার দুঃসাহস হ্যারির হল কি করে?

রমা রাও আমার মনের কথা বুঝতে পেরে ঘাড় দুলিয়ে সংক্ষেপে বললো, "ওস্তাদের মার শেষ রাতে !"